।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

ভূমিকা : মনে হয় আলো—তবু অন্ধকার

বর্তমান যুগ উৎকণ্ঠা এবং যন্ত্রণার যুগ । অবিশ্বাস এবং সন্দেহ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে চলেছে । অসুস্থতায় আক্রান্ত পৃথিবীতে অসুখ মানুষের শরীরে ; একই সঙ্গে উধাও হয়েছে সুখ মানুষের মন থেকেও । 'অদ্ভুত আঁধার' আজ পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত :

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া ।

(জীবনানন্দ, 'অদ্ভুত আঁধার এক')

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চিন্তাশীল মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়েছে চরম বিষাদ—'কেউ নেই , কিছু নেই— সূর্য নিভে গেছে !' (জীবনানন্দ , '১৯৪৬–৪৭') সুস্থতাহীন মানুষের মনে জমা হয়েছে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি ; শেষ পর্যন্ত এই ক্লান্তি তাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে মৃত্যুর দিকে ।

সেইখানে ক্লান্তি তবু —
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু —
এই ; (জীবনানন্দ ,'উত্তর প্রবেশ')

'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড় -- অলীক প্রয়াণ'–(জীবনানন্দ ,'এইসব দিনরাত্রি') সুতরাং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন ? —— সে তো অলীক কল্পনার মতই । ক্ষয়ে যাওয়া মন নিয়ে মানুষের দল যক্ষ্মা রোগীর মত কোনওক্রমে ধুঁকে ধুঁকে শ্বাস টেনে

চলেছে। বুঝে নিতে অসুবিধা ঘটে না — আমরা আজ সকলেই পঙ্গুত্বের শিকার— কম বা বেশি, — ' We are all cripples, every one of us — more or less; (ডস্টয়েভস্কি) জীবনের প্রায় সবকিছু থেকেই সুস্থতা যখন বিলীন হয়ে যায়, তখন শীতার্ত নির্জীব পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলতেই হয় :

সমস্ত পৃথিবী ভরে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে—বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে। কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস, —
যক্ষ্মার রোগীর মত ধুকে মরে মানুষের মন।
(জীবনানন্দ, 'জীবন')

যক্ষ্মারোগের আক্রমণে মৃত্যু ঘটেছিল কীটসের। ' Ode to a Nightingale ' কবিতায় তিনি যখন বলেন :

Where youth grows pale, and spectre thin, and dies,
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despair .....

তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠে সভ্যতার অসুখের ইঙ্গিতও। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যেমন প্রেতচ্ছায়ার মতন শীর্ণ হয়ে যায়, তেমনি স্পর্শকাতর আধুনিক মানুষ যখনই কিছু চিন্তা করে— তৎক্ষণাৎ সে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়, হতাশায় তার চোখের জ্যোতি মলিন হয়ে যায়। ব্যাধি শুধুমাত্র শরীরেই তার থাবা বসায় না, 'ভিতরে অসুখের' চিহ্নও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন দেখি ভোগবাদসর্বস্ব পৃথিবীতে উপভোগের প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এক দুঃসহ একাকিত্ব। নারী - প্রেম -শিশু — সবকিছু তখন অর্থহীন, প্রতিষ্ঠা-কীর্তির ধ্বজা তখন ধূলাতে লুটায়। চরম নৈরাশ্যে একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ তখন বেছে নিতে হয় লাশকাটা ঘরের শীতলতা।

জানি – তবু জানি
নারীর হৃদয়– প্রেম -শিশু - গৃহ - নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় —
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে ,
ক্লান্ত – ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে ।

(জীবনানন্দ ,'আট বছর আগের একদিন')

আসলে জীবনের যন্ত্রণা এত ব্যাপক ও গভীর – যে তা সর্বদাই আমাদের অস্থির করে তুলতে চায় । শরীরের ব্যাধি নিয়ে তবু হয়তো কিছুদিন টিকে থাকা যায় , কিন্তু মনের যে অসুখ তা আরও ভয়ঙ্কর । মৃত্যুর চেয়েও । বেঁচে থেকেও যন্ত্রণার লেলিহ শিখাতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় সবকিছু । সাহিত্যে এই নঞর্থক প্রসঙ্গের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে পাশ্চাত্য ধারাতে , উৎস সন্ধানে তখন তাঁর মনে হয়েছে , —

"মানুষ এখন এক বিরতিহীন নেতির মধ্যে বিচরণশীল ।
এই পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিশেবে
গত এক শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে আমরা
গণনাতীতবার নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের
চেতনার সঙ্গে মুখোমুখি হই -- ইয়েটস রিলকে
পাউন্ড এলিয়টের কাব্যে , ডস্টয়েভস্কি কাফকা মান্
জিদ্ সার্ত্রে কাম্যু হেমিংওয়ের উপন্যাসে ,
বেকেট আওনেস্কোর নাটকে ।"[১]

আধুনিক মন নিয়ে — আধুনিক ভঙ্গি দিয়ে তাঁরা আধুনিক বিশ্বের সমস্যা ও জটিলতাকে স্পর্শ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন । সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন জীববিজ্ঞানী ডারুইন (১৮০৯) , সমাজবিজ্ঞানী মার্কস (১৮১৮) , মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (১৮৫৬) এবং নৃবিজ্ঞানী ফ্রেজার (১৮৫৪) — এই চার জন পুরানো চিন্তা-ভাবনাকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন । —

"ডারুইন জানালেন, মানুষ অমৃতের সন্তান নয়, পশুর সন্তান। জানালেন, জীবজগতে বিবর্তনই সত্য, বিবর্তনের মূল নীতিগুলিই সর্বজীবের নিয়ন্তা। ঔপন্যাসিকের মনে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগল, আমাদের মৌল বানরত্ব কি আজও অটুট? এমন তো হতেই পারে যে, উপরকার একটা পাতলা আস্তরণকে আমরা মনুষ্যত্ব বলি, একটু আঁচড় লাগলেই ভিতরকার দগ্‌দগে পশুত্ব বেরিয়ে পড়বে। কেউ হয়তো তর্ক তুললেন, আদি উৎসটা বড়ো কথা নয়, মানুষ যেদিন থেকে মানুষ সেই দিন থেকেই তার পশুত্বের উত্তরণ ঘটে গিয়েছে। অমৃতত্ব তার পিছনে নয়, সামনে। এই আশার আলোটুকু নিবিয়ে দিলেন ফ্রয়েড। জানালেন মনের চেতন স্তরটা অগভীর, গভীর এলাকা হল অবচেতন এলাকা। সেখানে দুরুত পশুর বাস। কামনাই তার তন্মাত্র। সে কামনা যৌন কামনা, রিরংসা। মানুষ রিরংসা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের জীবনে সবার উপরে সেক্সই সত্য; তাহার উপরে নাই। মার্কস জানালেন, বিশ্বে অলৌকিকতার স্থান নেই। মানুষ যেমন প্রয়োজন ও বুদ্ধি অনুযায়ী সমাজকে তৈরি করতে করতে চলে, সমাজও তেমনি নিজের মতো করে মানুষকে গড়ে। সমাজে আছে শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থদ্বন্দ্ব, মানুষকে রূপ দেয় তার শ্রেণীগত অবস্থান। শ্রেণীদ্বন্দ্ব রূপ পায় বিপ্লবে,— সবার উপরে সেই বিপ্লবই সত্য। ফ্রেজারের বক্তব্য এঁদের মত ব্যাপক এবং মৌলিক নয়, কিন্তু আদিম সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে পিতাপুত্রের যে

> মরণান্তিক দ্বন্দ্বের কথা ফ্রেজার আমাদের শোনালেন, মানুষের অমৃতত্বের বিষয়ে মোহভঙ্গের পক্ষে তা যথেষ্ট।"[২]

পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রণার্ত ও অসুস্থ জীবন অনেক আগেই এসে গিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪–১৮) ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯–৪৫) বাংলা সাহিত্যের বুকেও এই সংশয়দীর্ণ যন্ত্রণাশ্রয়ী আধুনিকতাকে পৌঁছে দিল। তুমুল অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চাইল হিরণ্য-ভাবনা। আধুনিকতা আমদানির ক্ষেত্রে যদিও কল্লোলের সাহিত্যিকবৃন্দ বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন—তবু একথা কিছুতেই অস্বীকার করার নয় যে, রবীন্দ্র মননেই সর্বপ্রথম এই আধুনিক সঙ্কট বা সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছিল। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সেই ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি — "যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলি অসংযত হয়ে" (চোখের বালি, ১৯০৩)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের পটভূমিকাতে এই অসুস্থতা ঘনিয়ে উঠেছে বারবার।

> "রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে সেই দাম্পত্য-একাকিত্বের চেহারা সর্বাংশে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে মেলে না বটে, কিন্তু দাম্পত্য—পঙ্গুতার সেই রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগ্নতার জায়মান বীজটিকে যেন আমরা পেয়ে যাই।"[৩]

বিশেষত 'যোগাযোগ' (১৩৩৬) উপন্যাসটির কথাই ধরা যাক। স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পর স্ত্রীর চেতনা এবং উপলব্ধি যে-ভাবে চরম অশুচিতায় আক্রান্ত হয়েছে--- তা নজির বিহীন। কুমুর এই মূর্তিটি কী আধুনিক সমস্যার ভয়ঙ্করত্বকে চিহ্নিত করেনি? অপ্রেমে ধ্বস্ত দাম্পত্য-বন্ধনের যন্ত্রণাকে অভূতপূর্ব তীক্ষ্ণতায় স্পষ্ট করে তুলেছিলেন ইতিবাদের এই দেবপ্রতিম মানুষটি।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল — স্বীকার করতে আপত্তি নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষতা তাঁর মধ্যে ছিল না। 'দেবদাস' (১৯১৭) এবং 'দেনা-পাওনা' (১৯২৩) উপন্যাসের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে- সঙ্গে

অন্ধকারে ডুবে যাওয়া মানসিকতার ছবিটিও নৈপুণ্যের সাথে চিত্রিত করেছেন এই কাহিনীকার। জীবানন্দ তার অসুখকে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছে ষোড়শী বা অলকার উপর নির্ভর করে; কিন্তু দেবদাসের পক্ষে সে-রকম কোনও ভরসা ছিল না। "আর কত পথ ? এ কি ফুরোবে না ?"—এ প্রশ্নের উত্তরও তাই মেলেনি। ভগ্ন শরীর ও মন নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে তাকে।

পরবর্তী কালে অসুস্থ জীবনের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে যাঁর লেখনীতে পরিস্ফুট --- তিনি জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, কল্লোলের বর্ষীয়ান সদস্য হিসাবে যাঁর পরিচয়। তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) 'লঘুগুরু' (১৩৩৮) এবং 'গতিহারা জাহ্নবী' (১৩৪২) উপন্যাসে এই পৃথিবীর যে ছবি পাওয়া গেল -- তা দেখে আঁতকে উঠতে হয়। আমরা প্রায়শই মানবমহিমার কথা প্রচার করে থাকি উঁচু গলায়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করতে চাইলেন – ও সব একেবারেই মনগড়া ও বাজে কথা। অস্তিত্বের সঙ্কটে -যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তে ওষ্ঠাগত মানুষের প্রাণ, সুতরাং হতমান ন্যুব্জ মানবের যশ বিঘোষণার মধ্যে উদ্দেশ্য যাই থাক -- অর্থ কিছুই নাই। তুলনামূলক বিচারের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে 'গতিহারা জাহ্নবী'র মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক যা বলেছেন -- তাতে এই মোহমুক্ত স্পষ্টবাক্ সাহিত্যিকের মানসিকতা সহজেই অনুমান করে নিতে পারা যায়।

> "নারীর মাতৃত্বলাভে আকুলতা শরৎরচনার একটি প্রবল ও পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ। অনেক সময় সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই ভাবালুতার বাষ্প প্রবেশ করে সেই রচনাবলীতে। অথচ জগদীশচন্দ্রের 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরী যখন আবিষ্কার করে সে গর্ভবতী তখন দুশ্চরিত্র স্বামীর আত্মজের জননী হওয়ার সম্ভাবনাকে তার যুগপৎ মনে হয় হাস্যকর এবং হৃদয় বিদারক। সেই অশেষ কলুষজাত সন্তানকে তার মনে হয়েছে, 'ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।"[৪]

জগদীশচন্দ্রের পর আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলব--যিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য বিদ্রোহ, অসাধারণ বলিষ্ঠতা, অভূতপূর্ব বিস্ময়।

জীবনকে যাচাই করে নেওয়ার এমন চোখ ক'জনেরই বা হয়? ফ্রয়েডের লিবিডো, জৈব আদিম প্রবৃত্তি, নিয়তি, মার্কসীয় নিরীক্ষা—এই সবকিছু অবলম্বন করে মানিক শানিত করে তুলেছিলেন তাঁর আয়ুধ। সমস্ত কিছুর মধ্যেই অসহায় মানুষের যন্ত্রণা-ক্রোধ এবং অসুস্থতার ছবিটি স্পষ্ট। 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়ক হেরম্বকে উপস্থাপন করতে গিয়ে সমালোচকের পর্যবেক্ষণাতে আস্থা রাখা যেতে পারে,—

> "হেরম্ব এক 'নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষ।'
> 'নিজেকে হেরম্বের বড়ই পুরাতন মনে' হয়
> এবং সে এক 'মৌলিক অসুখে' ভোগে।
> সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ
> সুস্থ মানুষ হেরম্ব নয়। সে যেন সর্বদাই
> অপরাধী, অহরহ তাকে আত্ম সমর্পণ করে
> চলতে হয়।"[৫]

'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসে অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষ এবং নিয়ন্ত্রণকারী অজানাশক্তির পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। "বস্তুত জীবন রহস্যময় ও গতিশীল; তাকে চালনা করে অনির্বাণ অজানা শক্তি (নিয়তি) আর যৌনবৃত্তি; মানব মনের গতি কুটিল, এবং মানুষ অসহায় নিঃসঙ্গ ও জরামৃত্যুর অধীন—এই সব সত্য 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' এক নিপুণ তুলিকা সম্পাতে প্রবল বাস্তবতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমরা এই দাবিকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।"[৬] প্রসঙ্গত কাম্যুর 'The Plague' উপন্যাসের সঙ্গে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র তুলনা করা যেতে পারে। দুটিতেই অসুখের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। কাম্যুর উপন্যাসে জার্মানী কর্তৃক অবরুদ্ধ ফ্রান্সের পরিস্থিতিকে প্লেগে আক্রান্ত ওরান শহরের পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ব্যাপক অর্থে হয়তো শুধু জার্মাণ আক্রমণকে প্লেগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি, আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটকেও এক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে। প্লেগের মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত ওরান, জার্মাণ আক্রমণে পর্যুদস্ত ফ্রান্স এবং সঙ্কটে বিদীর্ণ আধুনিক সভ্যতা কাম্যুর উপন্যাসে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র মধ্যে বজ্রাহত হারুর মৃত্যু, জনমতের মর্যাদা দিতে গিয়ে আফিং খেয়ে যাদবের আত্মহত্যা, শশীর বোন বিন্দুর মদ্যাসক্তি প্রভৃতি মৃত্যু এবং অসুখ নিয়তিবাদের প্রতীক। গ্রামের

পরিবেশের মধ্যেই প্রোথিত আছে অসুস্থতার বীজ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক শশী সেই অসুস্থতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। "রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে। ....স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ন অনুভূতির আড়ত, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা: ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াসা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।"—এই মানুষগুলির প্রতি দায়বদ্ধ শশী মানুষগুলিকে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে সুখের জীবন যাপন করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পারে না। পারে না হাসপাতালের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে। আধুনিক সভ্যতা অসুস্থ এবং সঙ্কটে আপন্ন; কিন্তু মানুষের কাজ শশীর মত এই সভ্যতাকে নিরাময় করে তোলা। কামুর উপন্যাসের নায়কও শশীর মত পেশায় ডাক্তার। কামুর উপন্যাসেরও সূত্রপাত ডাক্তারখানায় সিঁড়ির গোড়ায় একটা মরা ইঁদুর দিয়ে। মড়ক সমস্ত শহরকে আক্রমণ করেছে। প্লেগ শুধু শহরবাসীদের শারীরিক ভাবে আক্রমণ করেনি—বিনষ্ট করেছে তাদের মূল্যবোধও। এই অসুস্থতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ডাক্তার রিউ এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু হাল ছাড়েন না। তিনিও শশীর মতন অসুস্থতা নিরাময়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি —সভ্যতাকে সঙ্কট-মুক্ত করাই মানুষের কাজ—শ্রেষ্ঠ কাজ।

> "শশী এবং রিউয়ের জীবনের স্পষ্ট, সচেতন,
> একান্ত লক্ষ্য হল: স্বাস্থ্য। তারা স্তর থেকে
> স্বীকার করে, তাদের জীবনের প্রাথমিক আদর্শ:
> আর্তকে ত্রাণ করা, মৃত্যুকে অস্বীকার করা। এই
> রোগজর্জর পৃথিবীকে সুস্থ সবল ক'রে তোলা,
> এই মৃত্যু কবলিত জগতে জীবনের জয়কেতন
> ওড়ানোই হল তাদের বাঁচার উদ্দেশ্য।"[৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) উপন্যাসটির মধ্যে অসুস্থ জীবনের রূপকাভাসকে চমকপ্রদ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চার দেওয়ালের গণ্ডিতে আটকে পড়া জীবনের

অবরুদ্ধতা, জটিলতা ও সমস্যা এখানে রূপায়িত। শুধু রাজকুমার নয়, আমরা সকলেই এই অস্বাভাবিক জীবনের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি।

> "শহুরে জীবনের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা,
> অস্বাভাবিকতা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার ফলে
> যে অশান্তি ও অ-সুখ দেখা দেয়,
> রাজকুমার তারই প্রতিনিধি। জীবনে
> অবসাদ ও দিশাহীনতা আসলে জীবন-
> বিমুখতা, রাজকুমার তারই শিকার।"[৮]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫২) উপন্যাসের মধ্যে "মৃত্যুর কাব্যময় রূপকে আবহ সঙ্গীতের মতো রক্ষা করে"[৯] যে দ্বন্দ্ব এর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন – প্রকৃতই তা অসাধারণ। ঔপন্যাসিকের কাছে মৃত্যু শুধু মৃত্যুতেই সীমাবদ্ধ নয়; তা হয়ে উঠেছে জীবনেরই অন্য রূপ। মৃত্যুর সময় ক্রন্দনরত পুত্রের উদ্দেশ্যে "জগৎ মশায় বলেছিলেন —তুমি কাঁদছ? তোমার দীক্ষা আয়ুর্বেদে। জীবন এবং মৃত্যুর কথা তো তুমি জান; তবু তুমি কাঁদছ? ছি। আমাকে দুঃখ দিয়ো না; তুমি কাঁদলে এই শেষ সময়ে আমাকে বুঝে যেতে হবে যে আমার শিক্ষা সার্থক হয় নি। তাছাড়া, মৃত্যুতে আমার তো কোনো দুঃখ নাই, আক্ষেপ নাই। পরম শান্তি অনুভব করছি আমি, সুতরাং তুমি কাঁদবে কেন?" প্রদ্যোত ডাক্তারের ওখানে অনেককাল পরে মঞ্জরীকে দেখে জীবন মশায় যখন বাড়ি ফিরে আসছিলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল —"সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি আরণ্য গজের মতো বেরিয়ে পড়েন মৃত্যু-শহুরের সন্ধানে। জনহীন দিকহারা প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে অথবা গভীর নিবিড় মহা অরণ্য থমথম করছে; অসংখ্যকোটি ঝিল্লীর ঐক্যতান ধ্বনিত হচ্ছে; মনে হচ্ছে মৃত্যুর মহাশূন্যতার মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ চলেছে জন্ম-জন্মান্তরে; সেই-খানে উল্লাসধ্বনি করে সেই মহাশহুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন নবজন্মের আশায়।" বুকের মধ্যে অনেক যন্ত্রণা ছিল, তবুও জীবনের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি— গভীর মমতা জীবন-মশায়কে করে তুলেছে কিংবদন্তীপ্রতিম।

জীবনানন্দ 'বোধ' কবিতার ভিতরে যে বিচ্ছিন্নতা বা প্রবাসবোধের কথা উচ্চারণ করেছেন, যে বোধের ফলে একজন মানুষ অন্য মানুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে —

'আমি একা হতেছি আলাদা', যে বোধের ফলে

.....পাবে না আহ্লাদ

মানুষের মুখ দেখে কোনো দিন ।

মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন ।

শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন ।

—সেই শূন্যতার বোধ সংক্রমিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও । জীবনানন্দের 'মাল্যবান' (রচনাকাল: জুন, ১৯৪৮) এবং 'সুতীর্থ' (প্রকাশকাল : ১৩৮৪) এই ''দুটো উপন্যাসেই সাকার হয়েছে এক অতি তীব্র বিবমিষা । এমন এক প্রতিকূল ক্লিন্ন বহির্জগতের সংস্রবে যেন তিনি এসেছিলেন এই সময়ে যে তিনি শত শত শূকরের চিৎকার ও শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার যন্ত্রণার আর্তনাদে মুখর কবিতা লিখেও তাঁর অদম্য ঘৃণাকে চূড়ান্ত প্রকাশ করে উঠতে পারেননি, তাই তাঁর দরকার হয়েছিল বিস্তৃততর মাধ্যম— উপন্যাসের বিস্তার ।''[১০] 'সুতীর্থ' উপন্যাসে বিরূপাক্ষজয়ন্তী এবং 'মাল্যবান'-এ মাল্যবান-উৎপলার যে দাম্পত্যজীবন আমরা পেয়েছি —সেখানে মূল্যবোধের বড় অভাব । অপ্রেম, বিরংসা, লালসা অর্থহীন করেছে মনুষ্যত্বের সাধনা । সৃষ্টি-শূন্য, শান্তিহারা সম্পর্কের মধ্যে জমা হয়েছে কলুষতার আবর্জনা । অতৃপ্তির অগ্নি বলয় গ্রাস করতে চেয়েছে সমস্তকিছুকে । এই দুটি উপন্যাসে যে অস্থিরতা ও দুঃখের পরিচয় আমরা পাই, তা আরোপিত নয় — চরিত্রের গভীরেই তার উৎস ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহিতা পরিলক্ষিত হলেও ''নগর জীবনের রূপায়ণে নরেন্দ্রনাথ যে প্রেমেন্দ্র মানিকেরই উত্তরসাধক তাতে সন্দেহ নেই ।''[১১] আমাদের মনে রাখতে হবে ''নরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার জগতে শুধু কুসুমই নেই, কীটও সেখানে বিস্তর''[১২] এবং এই কথার যাথার্থ্যতা প্রমাণিত হবে তাঁর 'চেনামহল' (১৩৬০) উপন্যাসে । একটি একান্নবর্তী পরিবারের পটভূমিকাতে মধ্যবিত্ত জীবনের নৈরাশ্য, শূন্যতা, যন্ত্রণা এবং বিক্ষোভের অনায়াস প্রতিফলন এখানে লক্ষ্য করা যায় । ''একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে ; এটা এতদিন আমাদের কাছে খবর হয়ে ছিল ; তার নানারকম অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আমরা করেছি । কিন্তু জীবন অর্থনীতি নয় । এই ভাঙনের পিছনে আরও কতশত কারণ যে অন্তর্নিহিত নরেন্দ্রনাথ তার সন্ধান দিয়েছেন এই বিশাল উপন্যাসে ।''[১৩]

সন্তোষকুমার ঘোষ বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের সৎ প্রচেষ্টাকে তুলে ধরতে চাইলেও অধঃপতিত সমাজ, অন্ধকারমাখা জীবনের বিসর্পিল গলিকেই বেশি মাত্রাতে চেনাতে চেয়েছেন। নাগরিক জীবনের অসুস্থতা পরিস্ফুটনেই যে তিনি অধিক আগ্রহী — একথা 'কিনু গোয়ালার গলি' (১৯৫০) 'মোমের পুতুল' (১৯৫৪) উপন্যাসে প্রমাণ হয়। 'কিনু গোয়ালার গলি' কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনে অসুখের রূপক। আলো বাতাসের স্পর্শ থেকে এই গলি বঞ্চিত। একইভাবে মণীন্দ্র শান্তির যৌথ জীবনেও দাম্পত্য-বন্ধনের স্বাভাবিক প্রত্যাশাটুকু অনুপস্থিত। মণীন্দ্রের ঔদাসীন্যে শান্তিকে যে জীবন বেছে নিতে হয়েছে —সেখানে সুস্থতা অন্তর্হিত। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে শান্তির ঢলাঢলি মণীন্দ্র দেখেও না দেখার ভান করে। তার নাটকে কিন্তু নায়িকার যে চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে — সেখানে শান্তি ধরা পড়ে যায়। উপন্যাসটির মধ্যে ইন্দ্রজিত জীবনবিমুখতার চূড়ান্ত নমুনা। উপন্যাসে নীলার উপস্থিতি মুক্ত বাতাসের মত। সে ইন্দ্রজিতকে নিজস্ব প্রেমস্নিগ্ধ চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেয়েছে। শেষাবধি গলির সুস্থতাহীন অবক্ষয়ী পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার মাধ্যমেই নতুন করে চিহ্নিত করা হয়েছে শুরু করার নতুন পর্বটিকে।

শরীর এবং মন — এই দুয়ের অসুখকে ধারাবাহিক ভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি বনফুলের 'মানসপুর' (১৯৬৫) নামক উপন্যাসে নায়ক বিশুদীপ এবং নায়িকা বিদুলাকে সামনে রেখে একটি ভয়াবহ ব্যাধির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। কুষ্ঠ ব্যাধি। শরীর ও মনকে কুষ্ঠ কীভাবে ক্ষয় করে চলেছে তা ঔপন্যাসিক বনফুল কল্পনা এবং বাস্তবের মিশ্রধারাতে, অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসধারাতে লোকনাথ ভট্টাচার্য একদা আলোড়নকারী একটি নাম। তাঁর 'যত দূর তত অরণ্য' (১৯৬৬) উপন্যাসটি প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বীকারোক্তি-মূলক উপন্যাসটিতে চরিত্রগুলি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে তারা নিজেদের বিশ্লেষণ করেছে, চিনতে চেয়েছে। যে জীবনে তারা প্রবেশ করেছিল সেখান থেকে নির্গমনের পথ কিন্তু রুদ্ধ। বুকের দরজাটা হাট করে খুলে ফেলতে গিয়েও সমস্যারণ্যে তাই দিশাহরা হয়ে যেতে হয়েছে সমস্যাক্রান্ত এবং আত্মানুসন্ধানী চারটি চরিত্রকেই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে ব্যক্তি-চরিত্রের যন্ত্রণা এবং অসহায়তা সুপরিস্ফুট।জীবনের পথ থেকে সহসা ছিটকে যাওয়ার বেদনা রূপায়িত হয়েছে সেখানে। আত্মস্বীকার-মূলক এইসব উপন্যাসগুলির মধ্যে 'সন্ধ্যার সুর' (১৯৬৬) বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। নায়ক তার স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু শীলা মরেনি। পরে সে শাস্তির হাত থেকে নায়ককে বাঁচাতে চেয়েছে। হত্যা নয়, আত্মহত্যার কথাই সে নাকি বলেছে। এ খবর কিন্তু নায়কের মনে স্বস্তি জোগায়নি বিন্দুমাত্র।" এ আমার বেঁচে থাকার খবর, না আরো বড়ো, আরো ভয়ংকর মৃত্যুর পরোয়ানা।.....আমার সমস্ত আশা, সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন, আমার মৃত্যুর মুক্তি কেড়ে নিয়ে আবার আমাকে জীবনের নরকে ঠেলে দিচ্ছেন আপনারা।"

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সমাজের কদর্যতা-বিকৃতি সম্পর্কে পূর্ণমাত্রাতেই সচেতন। "জ্যোতিরিন্দ্র বাবু যেন সমকালীন জীবনকে নিষ্ঠুরের কালো রঙে ছুপিয়ে দেখাতে চান। তাঁর দৃষ্টি এর ফলে আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। মানিকবাবুর মন্ত্রশিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র বাবু।"[১৪] এই মন্তব্যের সপক্ষে 'নীরার দুপুর', (১৯৫৩) 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫) 'প্রেমের চেয়ে বড়', (১৯৬৬), 'এই তার পুরস্কার (১৯৭২) প্রভৃতি উপন্যাসগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে অধোগতির এক ভয়ঙ্কর আলেখ্য। একই উঠোন ব্যবহার করতে হয়েছে বারটি পরিবারকে। পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি থাকলেও আভ্যন্তরিকভাবে যোজনব্যাপী ব্যবধান তাদের মধ্যে। দারিদ্র্যই শুধু নয়, স্বভাবের নীচতা উপন্যাসের প্রতিটি পুরুষ ও নারী চরিত্রকে মর্যাদাহীনতার শেষ সীমারেখাতে টেনে নামিয়েছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অসুস্থ ও কদর্য মানসিকতা যখন একাকার হয়ে যায়, তখন পরিস্থিতি কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে — তারই প্রমাণ রয়েছে এই উপন্যাস কাহিনীতে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে অবশ্য একটা কথা বলার দরকার,—তাঁর উপন্যাসে ক্ষয়শীল মধ্যবিত্ত জীবনের কথা নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু শুদ্ধতা-অন্বেষী মানসিকতাটি একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে নর-নারীকে তিনি অমলিন নৈসর্গিক পরিবেশে সংস্থাপন করে তাদের ম্লান হয়ে যাওয়া সচেতনতার শিখাকে যেমন উসকে দিয়েছেন, তেমনি অতিক্রম করে যেতে চেয়েছেন জীবনের শক্ত বাধাগুলি।

111475

28 SEP 1994

মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয়, অবিশ্বাস, অনিকেতন ভাবনা, পাপবোধ, স্বীকারোক্তি, সংগ্রাম, ভালবাসাকে অসাধারণ প্রয়াসে সাহিত্যে যিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন — নাম তাঁর সমরেশ বসু। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে জীবনের স্বরূপ সন্ধানে অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এই প্রতিভাধর শিল্পী। তাঁর 'বিবর' (১৯৬৫), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), পাতক (১৯৬৯) প্রভৃতি উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যাক। সন্দেহ নাই, জটিল জীবনের অসুস্থতাকে বারবার তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না জীবনের পূর্ণায়নে সমরেশের আগ্রহ ছিল অসম্ভব; বিবরের মধ্যে প্রবেশ নয়: নিষ্ক্রান্ত হওয়াই ছিল তাঁর অভিষ্ট। সমালোচকের মনে হয়েছে এই ঔপন্যাসিকের শিল্পসৃষ্টিতে "আসলে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে চূড়ান্ত সামাজিক সংকট; এবং হয়তো, সামাজিক সংকটের বৃত্তকে ছাড়িয়ে মানবিক সত্তার অস্তিত্বের সংকট।"[১৫]

সমরেশ বসুর উপন্যাসে অস্তিত্বের সঙ্কটের কথা বলতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে ডস্টয়েভস্কির 'Notes from the Underground' এবং কাম্যুর 'The Outsider' —উপন্যাসের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার প্রয়োজন।ডেস্টয়েভস্কির উপন্যাসে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের ছবি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে অন্ধকার এবং অসুস্থতা পৌনঃপুনিক ভাবে দেখা দিয়েছে। শিল্পীর 'Notes from the underground' -এ মানসিক অন্ধকারের গাঢ়তা - সঙ্ঘাত -অসহায়তা - পঙ্গুত্ব-বোধ যথেষ্ট ভাবে পরিস্ফুট। কাম্যুর উপন্যাসের নায়কও সুস্থ স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক থেকে সম্পূর্ণত সংযোগবিহীন; জীবন থেকে সে পলাতক। এই কারণেই মায়ের মৃত্যুর যথার্থ তারিখ তার পক্ষে মনে করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। — " Mother died today, or may be yesterday, I can't be sure", সমরেশ বসুর 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক'-এর মত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও এই জাতীয় সংযোগবিহীনতা, অপ্রকৃতিস্থতা, এবং আত্মক্ষয়ের যন্ত্রণা। এই সব উপন্যাসের চরিত্রগুলি এক দুরন্ত আক্রোশে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায়; এবং মুখ্য কারণ হিসাবে অসুখের গভীর যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কিছুকে চিহ্নিত করার দরকার হয় না।

'বিবর' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় —নামহীন নায়কের হাতে খুন হয়ে গেছে তারই শয্যাসঙ্গিনী নীতা। এই হত্যা হতাশায় পরিপূর্ণ পারিপার্শ্বিককে মুছে ফেলতে

চাওয়ার রূপক। বিবরের নায়ক চরিত্রটি যা-কিছু যন্ত্রণানির্ভর এবং গ্লানিসর্বস্ব —সেই সব কিছুর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।

'প্রজাপতি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখচাঁদ বা সুখেন গুন্ডা। প্রজাপতি অন্য কিছু নয়, মানবিক সৌন্দর্যের প্রতীক। সুখেন বাধ্য হয়েছে সেই প্রজাপতিকে হত্যা করতে। এবং এটা ঘটেছে পরিবেশের বিরুদ্ধ প্রভাবেই। প্রজাপতির নায়ক তার বাবা-মা-দাদাদের পরোয়া করে না, শ্রদ্ধা করে না। রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তার মনে কোনও মোহ নাই। তার ধারণা এ-সব হল আখের গুছিয়ে নেওয়ার প্ল্যাটফর্ম। মেয়ে সে কম ঘাঁটেনি না, কিন্তু তাতে সুখ কোথায়? নরনারীর যৌন আচরণে—আনন্দ খোঁজার তাগিদে বিকৃত কাম আর কদর্য ইতরামো ছাড়া অন্য কিছু তার নজরে আসেনি। উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। পরিশেষে চরম অন্ধকারের মধ্যেই ডুবে যেতে হয়েছে তাকে।

'পাতক' উপন্যাসের মধ্যেও সেই সর্বগ্রাসী অসুস্থতার অন্ধকার পরিস্ফুট —যেখানে সৎ এবং সুন্দর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়া জগতে নায়ক শুদ্ধতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত। বাবা-মা, অধ্যাপক-ছাত্রনেতা, —সকলকেই তার মনে হয় স্বার্থপর আর মতলববাজ। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, — "আমার চারপাশে যা কিছু আছে, যা কিছু চলছে, তার কোনোটাই আমার সহ্য হয় না।.....জ্বলুক, জ্বলুক, পুড়ুক, ধ্বংস হোক, সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে যাক, সমস্ত বর্তমানটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক ... ...।" সে জানে শুধু শরীর ঘাঁটলেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তবুও নারী শরীরের মধ্যেই আনন্দ অনুভবের নিরর্থক চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ক্ষয়ের আগ্রাসন তাকে বিধ্বস্ত করেছে, মাত্রাহীন আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে শেষ পর্যন্ত মাকে খুন করেছে সে।

দেশীয় রাজনীতির আকাশে ধূমকেতুর মত জ্বলে উঠতে চাওয়া একদল জেদি মানুষের অন্যতম রুহিতন কুরমির ঘর ও বাইর —দুই দিক থেকেই স্বপ্নভঙ্গের মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে অসাধারণ বলিষ্ঠতায় সমরেশ বসু বিধৃত করেছেন তাঁর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) উপন্যাসটিতে। কেন্দ্রীয় চরিত্র রুহিতন কুরমি। নকশালপন্থী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সে অন্যতম নেতা। মানুষটি একদিন স্বপ্ন দেখেছিল। এ-স্বপ্ন নতুন দিনের— নতুন জীবনের। "সেই সফল স্বপ্নে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবারা কথা কয়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। ভূমিহীনে ভূমি পায়। জনমজুরে রাজ্য চালায়।........" দিবা ঘ্নচির গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার ডাকে সেও একদিন উদ্বুদ্ধ হয়েছিল,' যদিও শেষ পর্যন্ত

নৈরাশ্য তাকে কুরে কুরে খেয়েছে । রুহিতন ধরা পড়ে জেলে থাকাকালীন সহকর্মী খেলু চৌধুরীকে দেখে উল্লসিত হয়েছে ; কিন্তু 'সব থেকে পুরনো সংগ্রামী বন্ধু' দিবা বাগচির সম্বন্ধে খেলু চৌধুরীর কথাবার্তা সে বরদাস্ত করতে পারে না । জেলে থাকার সময়ে রুহিতনের শরীরে লাল চাকা চাকা দাগ বেরিয়েছে । আসলে তার কুষ্ঠ হয়েছে , যদিও একদা সহকর্মীরা তা নিয়ে টাকায় কেনা 'লুবু খাঁকড়ি' সম্পর্কিত নোংরা ইঙ্গিত করতে বাধে না । জেলের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রুহিতনের আলাদা থাকার ব্যবস্থা মানসিকভাবে অন্য সকলের কাছ থেকে তাকে করেছে বিচ্ছিন্ন । জেল থেকে মুক্তি পেয়েই একবুক আকুতি নিয়ে সে ছুটে যায় তার বাড়ির দিকে ; যেখানে অপেক্ষা করে আছে 'দুবৈল গাভীর মতো স্নেহপরায়ণ আর শান্ত'মঙ্গলা— তার স্ত্রী , আর বড় আদরের ছেলেমেয়েরা । কিন্তু সেখানেও প্রবাসবোধের বেদনা—মোহভঙ্গের অসহ যন্ত্রণা । জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মানুষটির কাছে যারা ভিড় করে এসেছে তারা সবাই জোতদার মহাজন গোত্রীয় । মুক্তাঞ্চলের স্বপ্ন দেখা মানুষটি সময়ের এই পরিবর্তনে বিচলিত বিপর্যস্ত । ঘরে পৌঁছে রুহিতন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে বাড়ি-ঘরের হাল ফিরে গেছে । তার ছেলেরা ব্যস্ত---কারণ 'শিলিগোড়িতে একজন দিল্লীর যন্ত্রী আসবে ।' আর অনেক কিছু পালটে যাওয়ার সঙ্গে তাল রেখেই বোধহয় পালটে গেছে তার বৌ মঙ্গলাও । সে স্বামীর জন্যে আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে । কুরমির ভাল হয়ে ওঠার যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে মঙ্গলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।মায়ের একটা বহু উচ্চারিত গানের কথা রুহিতনের মনে পড়ে যায় , "উত্তরে উনাইল ম্যাঘ/পশ্চিমে বরষিল গ । / ভিজি গেল গাবানি কাপড় । ... কী জীবন ! কোথায় মেঘ ঘনায় , কোথায় বর্ষায় । জীবনের রঙীন কাপড়খানি কেন ভিজে যায় ।" শেষ পর্যন্ত হতমান রুহিতন চিহ্নিত গোপন জায়গা খুঁড়ে ডবল ব্যারেলের বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে । "সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো । বন্দুকটা রইল তার বুকের পাশে মাটিতে । কাত হয়ে মাথাটা রাখলো জোড়া ব্যারেলের ওপর । পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এলো । তার মনে এখন একটি মাত্র সান্ত্বনা ; সে অপমান আর অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে , সে বুঝতে পারছে , গভীর ঘুম আসছে তার ।" উপন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে মুক্ত-জীবন এবং মুক্তাঞ্চলের স্বপ্ন দেখা মানুষটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবেই বিধ্বস্ত । গভীর হতাশা তাকে যেমন হতচকিত করেছে —তেমনি করেছে

বিপন্ন । রুহিতন কুরমির কুষ্ঠরোগ প্রতীক হিসাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত ; যা তাকে সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ,—বিচ্ছিন্ন করেছে নিজস্ব ঘরের নিভৃত সুখটুকু থেকেও । একদা 'তরাইয়ের ভয়ংকর দাঁতাল' বনে পরিচিত মানুষটিকে তাই হয়তো নিদারুণ অপমান আর চরম অসহায়তার মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে চরম ঘৃণের অমোঘ আশ্রয়টিকেই ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালে কুষ্ঠরোগকে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রতীক হিসাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন তাঁর 'শাম্ব' (১৩৮৫) উপন্যাসে । ভূমিকাতে লেখক জানিয়েছেন ,—

> ".....আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি , যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না । যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও , নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন । ....."

'তোমার এই রমণীমোহন রূপ নিপাত যাক । কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক ।'— কৃষ্ণ শাম্বকে এই বলে শাপ দিয়েছিলেন । শাপগ্রস্ত হওয়ার পর শাম্বর শরীরে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বিচলিত করেছে কৃষ্ণকে । অসাধারণ রূপময় বংশধরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছেন "তাঁর নাসিকা মধ্যস্থল দুই গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন । তাঁর ভ্রূযুগল কেশহীন , সমস্ত মুখমন্ডল মলিন কালিমালিপ্ত এবং তাম্রাভ , কোথাও রক্তাভ শুষ্ক ঘা এবং অতি পলিত । বিশাল চক্ষুদ্বয়ের কৃষ্ণপুচ্ছ সকল পতিত হয়েছে , ফলে চোখ অতি রক্তাভ দগদগে দেখাচ্ছে । তাঁর সমস্ত দেহের চর্ম স্ফীত , বিবর্ণ , হাত পা বিকলাঙ্গের ন্যায় ।" মুক্তি অভিলাষী শাম্বর সঙ্গে মিত্রবনে যাদের দেখা হয়েছে তারা সকলেই কুষ্ঠগ্রস্ত । আরোগ্যের জন্যে তারা মিত্রবান এসেছে ঠিক , কিন্তু মনে তাদের বিন্দুমাত্র আশা নাই । 'এখানে সবাই রোগ সারাতে আসে , কিন্তু এমন কোনো দিব্য ব্যাপার নেই যে , রোগ সারে । চামড়া ভেদ করে আমাদের হাড়ে দুম্বো গজিয়ে যায় , আর আমরা মরে যাই ।' এইসব মানুষদের দেখে শাম্ব চমকে উঠেছেন । তাঁর মনে হয়েছে তিনি বোধহয় ভুল জায়গায় এসে গেছেন । এ কখনও আরোগ্যস্নান মিত্রবন হতে পারে না । "এদের সকলের পরিহাসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি অবিশ্বাসই ধ্বনিত হচ্ছে । তিনি বুঝতে পারছেন , নানা স্থান থেকে এরা এখানে এসেছে , সংঘবদ্ধভাবে

জীবনযাপনের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করেছে। এদের কারো সঙ্গেই কারোর কোনো সম্পর্ক নেই। বংশপরম্পরা বলেও কিছু নেই। সমাজ ও সংসার থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যাধিগ্রস্ত বাহিনী, যারা আরোগ্যের আশা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আরোগ্যলাভ দূরের কথা, ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুকেই এরা অবধারিত জেনে কিছুদিনের জন্য যদৃচ্ছা জীবন ধারণ করে যাচ্ছে। এদের কোনো আশা নেই, অতএব কোনো বিশ্বাসও নেই। অথচ এরা অবিশ্বাসী ছিল না। তাহলে এখানে আসতো না।" শাম্ব নিজেও ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর অদম্য জেদ। আরোগ্য লাভের। কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র নিজের নয়। অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্তদের মুক্তির জন্যেও ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তিনি। সকলে নয়, কেউ কেউ শাম্বর মনোভাবকে বুঝতে পেরেছিল। এদেরই একজন নীলাক্ষি। অসামান্য রূপসী হয়েও সে কুষ্ঠে আক্রান্ত। কামাতুরা এই নারী একদিন কামনা করেছিল শাম্বকে। 'একজন পুরুষ না থাকলে আমার সবই ফাঁকা লাগে।' আগে সে যার সঙ্গে থাকত সে এখন মৃত। তার জন্যে যে মন খারাপ করে না — তা নয়, কিন্তু নীলাক্ষির কাছে ও-সব এখন অর্থহীন। শাম্বকে সে জানিয়েছে, — 'আমাদের ঘর সমাজ বলে এখন কিছুই নেই। মরতে মরতেও আমরা আমাদের নিয়েই থাকবো। আমাদের এখন কোনো পাপও নেই, পুণ্যও নেই। পুড়ে যাওয়া পাখা মৌমাছি যেমন ফুলের গায়ে লেগে থেকে মরে যায়, আমরা সেইভাবেই মরতে চাই। যেটুকু সুখ মেটে তাই মিটিয়ে নিই। তুমি আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে আমি সুখী করবো।' শেষাবধি ক্ষণজীবনের এই উপাসিকাকে আমরা নতুন রূপে পেয়েছি। একদা "সে ছিল বিশ্বাসহীনা, প্রত্যহ যে কোন পুরুষের সহবাসে অভ্যস্ত কামতাড়িতা।" শাম্বকে অনুসরণ করে নীলাক্ষি হয়ে উঠেছে "ধ্যানমগ্না পূজারিণী।" হয়ে উঠেছে "সর্বাপেক্ষা শ্রীময়ী।" শাম্ব প্রমাণ করেছেন "ব্যাধি হলেও আরোগ্যলাভের নানা উপায় আছে।" 'আশা' এবং 'বিশ্বাস' এই দুটিকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই আছে উত্তরণের ঠিকানা। আরোগ্যপ্রাপ্ত শাম্বর মন থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বারকায় "রাজকীয় সুখভোগের" বাসনাও লুপ্ত হয়েছে। মুক্তির আলোকে তাঁর সামনে উন্মোচিত হয়েছে সুখানুভবের নবদিগন্ত। ঔপন্যাসিক পুরাণাশ্রিত উপন্যাসটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন বিশ্বাসই হল মূল কথা। আধুনিক জীবনের যে সঙ্কট আমাদের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে চলেছে — তা এই কুষ্ঠরোগের মতই মারাত্মক। শাম্বর মনে যে গভীর বিশ্বাস তাঁকে মুক্তি-

দিয়েছিল , প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল , অধিকাংশর মধ্যেই তা থাকে না । ফলত অসুখ থেকে আরোগ্য সম্ভাবনাও ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে থাকে ।

সমরেশ বসুর উপন্যাস ছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ ' (১৩৮৮) উপন্যাসটির মধ্যেও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জীবনের কথা বিশেষ ভাবে তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে । উপন্যাসটির মধ্যে এই মারাত্মক ব্যাধি মানবিক সম্পর্কের উপরে ছায়াপাত করেছে । ক্ষয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে চরিত্রগুলি কখনও মনের সারল্য এবং বিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেছে ; কখনও আবার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে চেয়েছে অগ্রসর হতে , পুনর্বসিত জীবনে স্থিত হতে । শুধুমাত্র বিয়োজন নয় , সংযোজন অভিযোজনের প্রক্রিয়াও উপন্যাসে দুর্লভ নয় ।

প্রাচীন কাল থেকেই কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে মানুষের মনে একটা ভয়ঙ্কর ভীতি ছিল । কুষ্ঠরোগীদের গলায় ঘন্টা বাঁধা থাকত , নগরের পথে তারা যখন চলাচল করত , তখন গলঘন্টের আওয়াজে অন্য নাগরিকরা তফাতে সরে যেত , যাতে কুষ্ঠরোগীদের ছায়াটুকুও গায়ে না লাগে । সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত ' কবিতার মধ্যে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে :

.....পুরাকালীন শহরে
গলঘন্ট কুষ্ঠরোগী , যত দ্বার সব বন্ধ দেখে ,
যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষা ব্যতিরেকে ।

কুষ্ঠরোগ তাই দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । শুধুমাত্র কুষ্ঠই নয় , যক্ষ্মা , ক্যানসার , প্লেগ , লিউকোমিয়া , ইনস্যানিটি , সিফিলিস , এডস প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগুলিও সভ্যতার হতাশ্বাসকে বিশেষভাবেই প্রকট করে তুলেছে । এইসব মারাত্মক অসুখ জীবনকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে ; একই সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের সমস্যাবলিকে নির্দেশ করে প্রতিমান রূপে ব্যবহৃত হয়ে । আমেরিকান লেখিকা সুজান সনট্যাগের ' Illness as Metaphor (Penguin,1988) গ্রন্থে এই সম্পর্কে চমৎকারভাবে আলোকপাত করা হয়েছে ।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্যানসার ব্যবহৃত হত অবস্থা বা ঘটনার ভয়ঙ্করত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্যে । ক্যানসারের রূপকগুলি ছিল বিশেষভাবেই স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ।

ট্রটস্কি স্তালিনপন্থাকে মার্কসবাদের ক্যানসার বলে অভিহিত করেছিলেন । চীনের 'Gang of Four' কে ' The Cancer of China ' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল । নিকসন-এর 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ' সম্বন্ধে বলা হয়েছিল " We have a Cancer within — close to the presidency — that's growing. " ইস্রায়েল সম্বন্ধে মন্তব্য করা হত , — " A Cancer in the heart of the Arab World অথবা " The Cancer of the Middle East." ভিয়েৎনামে যুদ্ধরত আমেরিকানদের সম্বন্ধে যে , উক্তিটি প্রয়োগ করা হয়েছিল —তাও স্মরণযোগ্য — The white race is the Cancer of human history."

প্রসঙ্গত আলেকজান্দার সোলঝেনিৎসিনের 'Cancer Ward' উপন্যাসটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । " বড়ো লেখক মাত্রেই প্রত্যক্ষ জীবনের কথা , সমাজ–জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাধিগুলির কথা , ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের কথা লেখেন যা ছড়িয়ে যায় দেশে , দেশে , লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকের অন্ধকারে যা ঢেউ তোলে , অবহেলিত পদদলিত মানুষের দল ঝান্ডা তুলে হাঁক পাড়ে , ত্রাসে কেঁপে ওঠে বজ্রসুকঠিন রাজশক্তি , রাজছত্র ভেঙে পড়ে , যা মন্দ্রিত করে তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি ।"[১৬] সোলঝেনিৎসিনের এই উপন্যাসটির মধ্যেও সেই প্রত্যক্ষ জীবন , প্রত্যক্ষ ব্যাধি এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামীদের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে । উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য কস্তোগ্লতভ , রুসানভ , হয়েফ্রেম প্রভৃতি । কস্তোগ্লতভ এবং রুসানভের চারিত্রিক বৈপরীত্য পরস্পর বিরোধী দুই সূত্রে মেরুর অবস্থানকে নির্দেশ করেছে । প্রথমজন জীবনের গভীর প্রত্যয়ে সতত উদ্বোধিত —যদিও মৃত্যুর পরোয়া বিন্দুমাত্রও সে করে না । উপন্যাসের নায়ক চিরবিপ্লবী কস্তোগ্লতভ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে হাসপাতাল থেকে ফিরে গেছে — এই সময় তার দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠেছে পালাবদলের পালা । অন্যদিকে ফিরেছে ক্ষমতার দালাল রুসানভও । রোগভোগের দুঃসহ আতঙ্কে সে সর্বদাই কম্পিত থেকেছে । এখন তার চেষ্টা নতুন করে যোগসাজসের মাধ্যমে সমাজে প্রতিপত্তির ধ্বজা তুলে ধরা । "রুসানভ চরিত্রটি নিয়ে লেখক নির্মম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা চালিয়েছেন , এবং সে নিরীক্ষা রোগবিদ্যা ও অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যাযতোই বটে—চরিত্রটির মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে এক ভয়াবহ শূন্যতা । "[১৭] আমাদের জানা আছে ক্যানসার হয়েছিল

স্বয়ং সোলঝেনিৎসিনের । লেবর ক্যাম্পের দুঃসহ অত্যাচার এবং এই ব্যাধি---- এই দুটিকেই পরাভূত করে তিনি 'Cancer Ward' এর মত যুগান্তকারী উপন্যাসী রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ; যা , সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল । " The subject is specifically and literally Cancer' যদিও লেখককে সতর্কতার সঙ্গে ঘোষণা করতে হয়েছিল , তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে সামাজিক দূষণের শ্বাসরোধকারী পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে এবং এক ভয়ঙ্কর শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামাজিক ক্যান্সারকে চিহ্নিত করা ও পচনশীল কাঠামোর মধ্যেও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষ্যদান স্বভাবস্বাধীন শিল্পীর মহত্তর জীবনপিপাসাকেই ইঙ্গিত করেছে ।

স্বভাবে ভয়াবহ বিভিন্ন অসুখগুলি শুধুমাত্র কলুষতার ক্রূর কল্পনাকেই প্রকাশ করেনি, একই সঙ্গে পরিস্ফুট করেছে শক্তি -দুর্বলতা -উৎসাহের মিশ্র ধারাটিও। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিপরীতমুখী তুলনা রূপায়িত হয়েছিল জীবন এবং অসুস্থতার মধ্যে । অসুস্থতা যেন মৃত্যুরই সমীকরণ। বর্তমান ধারণাতে অসুস্থতার রূপকগুলি শাস্তি বা চাবুক হিসাবেই নয় , অমঙ্গলের প্রতীক রূপেও চিহ্নিত । অসুখের রূপকগুলির মধ্যে যেমন রহস্য ঘনীভূত — তেমনি ঘনীভূত হয়েছে অমঙ্গলের ভয়ঙ্কর কল্পনাও । এবং এর জন্যে আমাদের অপ্রতুল সংস্কৃতিমনস্কতাকেই দায়ী করা যেতে পারে । মৃত্যুর প্রতি অগভীর দৃষ্টিভঙ্গি , ক্রমবর্ধমান হিংস্রতা , প্রগতিশীল সমাজ গঠনে ব্যর্থতা প্রভৃতি এই সব অসুখের রূপকগুলি নির্বাচনে বা ব্যবহারে আমাদের আগ্রহী করে তুলছে ।

বিভিন্ন ব্যাধিগুলি ভয়ঙ্কর দস্যুর মত আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দিত সন্দেহ নাই , কিন্তু অসুস্থতা থেকে নির্গত বিষণ্ণতা আক্রান্তকে প্রায়শই করে তুলত সংবেদনশীল এবং সৃষ্টিধর্মী । 'Romantic agony' এবং 'Romantic Personality'— কথাগুলি অসুস্থতা থেকেই ক্রমপ্রচলিতি লাভ করেছিল । যেহেতু অসুখে আক্রান্ত মানুষগুলি জন্ম নেয়
মৃত্যুর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামশীল —সেইজন্যে অসুস্থতা থেকে এক তীব্র সংবেদনশীল সামর্থ্য , এক সৃজনশীল প্রতিভা, এমন ধারণা নতুন মাত্রা পেয়ে হয়ে উঠেছিল মজবুত ।

যদিও পরবর্তীকালে লায়নেল ট্রিলিং তাঁর বিখ্যাত' Art and Neurosis' প্রবন্ধে এইসব ধারণাকে খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন , তবু আমাদের মনে পড়ে খ্যাতনামা মার্কিন সমালোচক এডমান্ড উইলসনের 'The Wound and the Bow'

নামক উদ্দীপক প্রবন্ধটি কথা । এই প্রবন্ধে তিনি গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের 'Philoctetes' নাটকের কাহিনী অবলম্বনে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন । এই নাটকের নায়ক ফিলোক্টেটস অসুস্থতাজনিত কারণে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন । দুর্গন্ধ ক্ষত নিয়ে ফিলোক্টেটস সেই দ্বীপে দশ বছর যাপন করেন । অথচ ট্রয় যুদ্ধ জয়ের জন্যে এই ফিলোক্টেটসের ধনুকের প্রয়োজন হয়েছিল ; এই ধনুক ব্যতিরেকে ইউলিসিস যুদ্ধে জয়ী হতে পারত না । অর্থাৎ ফিলোক্টেটস অসুস্থ , কিন্তু তাঁর ধনুক যুদ্ধ জয়ের জন্যে প্রয়োজন — " They can not have the irresistible weapon without its loathsome owner, "[১৮] অসুস্থতার মধ্যেই নিহিত ছিল ফিলোক্টেটসের শক্তি । শিল্পীরা অনেক সময়েই অনুভব করেছেন কুষ্ঠ , যক্ষ্মা , ক্যানসার—প্রভৃতি দুরারোগ্য রহস্যময় অসুখ অসুস্থ মানুষটিকে অনেক সময়েই আত্মিক শক্তিতে , দিব্যদৃষ্টিতে বা অন্তর্দৃষ্টিতে ভূষিত করে দেয় । এবং সেই শক্তিতে অসুস্থ মানুষটি এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা স্থূল সুস্থ মানুষের নজরেই পড়ে না । এ-ছাড়া অসুখ আত্মপ্রবঞ্চনা এবং ব্যর্থতায় মগ্ন চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টিকেও স্বচ্ছ করে তুলত । রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত , তখন সে তার সমগ্র জীবনের মিথ্যাকে , বিচ্যুতিকে কোনও আস্থাভাজন আপনজনের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করত । চিকিৎসকরা মনে করতেন , অসুখ হল শরীরের মাধ্যমে ক্ষোভিত বক্তব্য , মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভাষা এবং আত্মপ্রকাশের প্রয়াস । অসুস্থতার ভিতর যে-কোনও ধরনের সামাজিক বিচ্যুতি রূপায়িত হতে পারে । অসুস্থ চরিত্রকে অভিযুক্ত করা বা শাস্তি দেওয়া হয় না , কিন্তু তাদের অনুধাবন করা হয় ও পরিচর্যাও ।

অসুস্থতার মধ্যে একদিনে যেমন মৃত্যুর উত্তাল আহ্বান, অন্যদিকে তেমনি তারই ভিতর অনুভূত হয় ক্ষণজীবনের বিহ্বল-বিলাস । কাফকা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

" Come to think that tuberculosis ... is no special disease or not a disease that deserves a special name, but only the germ of death itself, intensified ... "

ক্যানসার যে কত মারাত্মক তা অপর একটি অভিমতেও প্রকাশিত , — "What is not fatal is not Cancer," কিন্তু জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সত্ত্বেও শেলী

কীটসকে এই বলে সান্ত্বনা জুগিয়েছিলেন : " This consumption is a disease particularly fond of people who write such good verses as you have done ... "

টোমাস মান্-এর উপন্যাসের মধ্যেও জীবনের উচ্ছলতাকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে । কামনা করা হয়েছে আনন্দ এবং সুখের অনুভবকে । ' The Magic Mountain' উপন্যাসে তিনি বলেছেন , — " Symptoms of disease are nothing but a disguised manifestation of the power of love, but all disease is only love transformed ".

ব্যক্তি এবং সমাজের চিরকালীন দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের পটপ্রেক্ষিতেই তাঁর উপন্যাসে হয়তো অসুস্থতা , ক্ষয়শীলতা এবং মৃত্যুর ছড়াছড়ি । তাহলেও এই সবকিছুকে অতিক্রম করে তিনি জীবন-সত্যের অনুসন্ধানেও ব্রতী হয়ে উঠেছিলেন — সন্দেহ নাই । প্রসঙ্গত 'The Magic Mountain' উপন্যাসটির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক । সমালোচকের ধারণা অনুযায়ী , — "মান-এর অন্তর্ভেদী জীবনদৃষ্টি জীবনের বহিরঙ্গের সমস্ত রুগ্নতা , দুর্বলতা এবং খর্বতাকে ভেদ করে জীবনের সত্যস্বরূপের শুশ্রূষাসন্ধানকে এই উপন্যাসে শিল্পের উৎস বলে মনে করেছে ।"[১৯] ১৯২৪ খৃ: রচিত উপন্যাসটি যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্যে আল্পসের শৈল-শিখরে অবস্থিত এক স্যানাটোরিয়ামের পটভূমিকায় রচিত । প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী "পশ্চিমী সভ্যতার সর্বাত্মক বৈবর্ণ্যের রূপকধর্মী মহাভাষ্য"[২০] হিসাবেও মান্-এর এই উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে । উপন্যাসটিতে সেই বিচিত্র আলোর বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায় যেখানে অসুস্থতার ক্ষয়শীল পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও অপরাহত হয়ে উঠেছে চলিষ্ণু জীবনের বারতা । উপন্যাসটির বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যক্তি-মানসের ভাবনা-অভিমত যেমন প্রকাশিত—তেমনি ভাবেই পরিস্ফুট সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন স্তরগুলি । কাহিনীর নায়ক হ্যান্স কাসটর্প , এই যুবকের জীবন-অন্বেষাকেই অসাধারণ ভাবে কাহিনীতে রূপ দেওয়া হয়েছে । অসুস্থতা ও ক্লান্তি হ্যান্সের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটিকে ব্যাহত করতে পারেনি । অসুখকে বহন করেও সে জীবনের উষ্ণতাকে অনুভব করতে উৎসুক । স্যানাটোরিয়ামের অন্যতম চরিত্র ক্লাভদিয়ার প্রতি প্রেমানুরাগ তার জীবন-বিকাশেরই অন্যতম শর্ত । হ্যান্সের মধ্যে সেই জাগ্রত জীবনবোধ দুর্লক্ষ্য নয় — যা সুস্থ মানুষের পরিচয়কে নিরন্তর বহন করে থাকে । হ্যান্স 'Native blemishes' স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নয়।'Essence of sensuality and desire' থেকেও সে বিচ্যুত থাকতে চায় না । এই যুবকের কাছে জীবন শুধুমাত্র ফুলের পবিত্র

মুগ্ধতাতেই আচ্ছন্ন নয় । আরও কিছু :

" He beheld the image of life in flower, its structure, its flesh-born loveliness !"

উপন্যাসের মধ্যে জীবনবীক্ষণের গভীরতা যেমন আমাদের মনকে আলোড়িত করে , তেমনি 'Walpurgis Night' - এর কৌতুকময়তা এবং অন্তরালস্থিত বিষাদময়তাও নাড়া দিয়ে যায় । কাস্টর্প নিজে অসুস্থ কিন্তু ' Elemination of human suffering ' বিষয়ে কম ভাবিত নয় সে । জীবনসত্যের রহস্যোদ্ঘাটনে ব্রতী 'সময়হীন সময়ের প্রতীক' এই চরিত্রটি স্বাভাবিক বা সুস্থ না হয়েও মানসিকভাবে সদা জাগ্রত । বিপর্যয়ের মধ্যেও সে অপরাজেয় ।

"Was he hit ? He thought so,
for the moment. A great clod
of earth struck him on the
shin, it hurt, but he smiles
at it. Up the gets, and staggers
on, limping on his earth-bound
feet, all unconsciously singing :
" Its waving branches wh - ispered
A mess - age in my ear —"

দোলায়িত পত্র-পল্লবের এ বাণী অপ্রতিহত সঞ্চরমান জীবনের অগ্রগমনকে যে নির্দেশ করতে চেয়েছে , তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয় ।

আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ব্যক্তি-বিশেষের অসুস্থতা তাকে যে শুধুমাত্র নিঃশেষই করেছে এমন নয় ; ঊর্ধ্বায়নেও সমর্থ করেছে । বাংলা উপন্যাসধারাতেও এই বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয় । অন্ধকারকে গাঢ় করতে গিয়ে আলোর দিকে চিরতরে মুখ ফিরিয়ে থাকা কখনই সম্ভবপর নয় । এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি উপন্যাস শিল্পী বিমল কর-ও এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন । তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে পাত্র-পাত্রী শরীরে এবং মনে গুরুতর অসুস্থ, এবং এই অসুস্থতাই আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে পেয়ে গেছে এক প্রতীকী মাত্রা । অসুস্থতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি আগ্রহ এই সকল চরিত্রের মন থেকে উবে যায়নি একেবারে । আলোর

প্রদীপ হয়তো বেচে দেওয়া সম্ভব — কিন্তু বুকের মধ্যেও যে ঝড় জাগে এবং তার দায়কে অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয়, — এ-কথাও আমাদের জানিয়ে দিতে তিনি ইতস্তত করেননি। এই সত্যান্বেষী শিল্পীর বারম্বার মনে হয়েছে — ভালবাসাতেই আরোগ্য, বিশ্বাসেই সঙ্কটের অবসান। মানবিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অ-সুখের যাত্রাকে স্পর্শ করেও সময়ের যন্ত্রণাকে — অসময়কে তিনি ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে সৃষ্টির প্রধান শর্ত, — মানবিকতা। তাই অসুখে বিধ্বস্ত জীবন, মৃত্যু সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত জীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়েও তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পূর্ণতার অনুধ্যানে— অনুসন্ধানে। তিনি জানেন, —

আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
জীবন্ত বীজাণুর মতো। (সমর সেন, 'ঝড়')

কিন্তু তিনি গভীরভাবেই বিশ্বাস করেন :

.....এই পথে আলো জ্বেলে—এ-পথেই
পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
(জীবনানন্দ, 'সুচেতনা')

সুতরাং অনিবার্যভাবেই আমরা দেখতে পাই, আলোর লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে এই শিল্পী হয়তো অন্ধকারে সহসা ডুবে গিয়েছেন; কিন্তু আশা এবং বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি কখনই ঘটেনি তাঁর; এই আশা-বিশ্বাস একান্তভাবেই উত্তরণের এবং এখানে শিল্পী বিমল করের সার্থকতা।[২১]

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস '-৮৮ পৃ: ২৩

২. 'উপন্যাসের শিল্প ও সমাজ বাস্তবতা' সাপ্তাহিক দেশ , ৪ ফেব্রুয়ারি ,'৮৯, পৃ: ৩৬

৩. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , তদেব , পৃ: ২৩

৪. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , তদেব , পৃ: ৫৪

৫. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , তদেব , পৃ: ২০৬

৬. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় , 'কালের প্রতিমা'- ৯১ , পৃ: ৭৬

৭. নবনীতা দেব সেন , 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধ '—১৩৮৪ , পৃ: ১৩৩

৮. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় , তদেব , পৃ: ৮২

৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় , 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক '- ১৯৮৩ , পৃ: ১৯

১০. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , তদেব , পৃ: ২৩২

১১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় , 'নিঃশব্দ প্রবেশ নিঃশব্দ প্রস্থান ' কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র ' প্রবন্ধটি সংগৃহীত হয়েছে 'শিল্প সাহিত্য দেশকাল '- ১৯৮১ গ্রন্থ থেকে , পৃ: ১৭১

১২. সত্যেন্দ্রনাথ রায় , তদেব , পৃ: ১৭২

১৩. ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী , 'বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ ', ১৯৮৯ পৃ: ৫৪

১৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর '-৮৮ , পৃ: ৩৯০

১৫. ড. অশ্রুকুমার সিকদার , তদেব , পৃ: ৩০৫

১৬. সত্যপ্রিয় ঘোষ , 'ক্যানসার ওয়ার্ড ' 'ক্রান্তি ' , ৬ষ্ঠ বর্ষ -১ম সংখ্যা , পৃ: ৩১

১৭. সত্যপ্রিয় ঘোষ , তদেব , পৃ: ৩৫

১৮. Edmund Wilson, ' The Wound and the Bow ' — University Paper back, 1961, P. 264.

১৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , তদেব , পৃ: ৩৮

২০. ড.দেবীপদ ভট্টাচার্য , 'উপন্যাসের কথা '- ৬১ , পৃ: ২৫২

২১. প্রসঙ্গত ১৩৯৮ সনের আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে বিমল করের প্রতিভাষণের অংশ বিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে , ----"মানুষের কাছে একমাত্র দায় তার নীতি-বিবেক। মানুষের বিবেক এবং সততাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে । আশা না থাকলে সে বাঁচতে পারে না ।"

সূত্র : আনন্দ বাগচীর প্রতিবেদন , দেশ , ২৩ মে-১৯৯২